

উপনির্বাচনেও এত নীচে নামতে হচ্ছে কেন?



সূচিপত্র

রাজনীতি

মমতার চেয়েও বেশি অসহায় যেন শুভেন্দু

☐ রক্তিম মিত্র

মায়েদের ললিপপ দেওয়ার সেই ট্রাডিশন
সমানে চলছে

☐ সৃজন শীল

হুমায়ূনের কাছে সব ‘মাস লিডার’কেই
লান মনে হয়

☐ অজয় কুমার

ওপেন ফোরাম

শরিকের চেয়ে বড় শত্রু নেই

☐ রক্তিম মিত্র

অন্তত একটি পূজো সংখ্যা কিনুন

☐ অরিত্র দাস

খেলা

ঘৃণা নিয়ে নিজেরা থাকুন, ওঁদের খেলতে
দিন

☐ ধীমান সাহা

ব্রাজিল ম্যাচেও মুখ পোড়া সময়ের অপেক্ষা

☐ বিপ্লব মিশ্র

বিনোদন

পঞ্চায়েতের মতোই, গ্রাম চেনার সহজ
পাঠ

☐ বিপ্লব মিশ্র

সেই তো থ্রিলার আর ভূত

☐ মলয় সেন

ভ্রমণ

মধ্যবিশ্বের মানচিত্রে আসুক সুন্দরবন

☐ মেহা সেন

নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা

☐ উত্তম জানা

রবি ঠাকুর কিম্বদ এখানে এসেছিলেন

☐ উত্তম জানা

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩,
সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫
৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী



আসল চ্যালেঞ্জ

বিরাট জয় বললে কমই বলা হয়। শাসকের সেই বিরাট জয়ের পর বিরোধী শক্তিও ভেঙে চুরমার। মূল বিরোধী দল এখন শাসকেরই অনুগত। তৃণমূল সেই ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। বাম বা কংগ্রেস কিছুটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেও এখনও মূল বিরোধী হয়ে ওঠেনি। এখনই তারা কোনও নির্বাচনে জিতে যাবেন, এমনটা কল্পনা করা দিবাস্বপ্নের মতোই।

কিন্তু তারপরেও দুই উপনির্বাচনকে ঘিরে শাসকের যে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, তা গণতন্ত্রকে যথেষ্ট সংকটেই ফেলে দিয়েছে। নন্দীগ্রামে যে বিজেপি বড় ব্যবধানেই জিতবে, এ নিয়েও সংশয় নেই। কিন্তু সেই বড় ব্যবধানকে আরও বড় করতে গিয়ে প্রশাসন যে ভূমিকা নিচ্ছে, তা অত্যন্ত ন্যাকারজনক। কখনও তৃণমূল প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিতে হচ্ছে। কখনও কংগ্রেস প্রার্থীকে ১৯ বছরের পুরনো মামলায় জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে। এত তৎপরতার কোনও দরকারই ছিল না।

রেজিনগরের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম। ধর্মীয় মেরুকরণে বিজেপি খানিকটা পিছিয়ে। তারপরেও সেই চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে জেতার চেষ্টা করা যেতেই পারত। কিন্তু হুমায়ুন কবীরকে যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে,

তা স্বচ্ছ প্রশাসনের নমুনা হতে পারে না। হুমায়ুন যদি সাম্প্রদায়িক প্রচার করেও থাকেন, বিজেপির প্রচার তার থেকে অনেক বেশি নিন্দাজনক। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কথায় প্ররোচনা তার থেকে ঢের বেশি। এখানেও ভোট জিততে হুমায়ুনের দলের লোকদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রশাসনিক স্তর থেকে নানা প্রলোভন বা হুমকি তো আছেই। তৃণমূলের মতোই বিজেপিও নিজেদের সংগঠন নয়, পুলিশের ওপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

এই উপনির্বাচন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সত্যিই বড় চ্যালেঞ্জ। জেতাটা বড় চ্যালেঞ্জ নয়। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ থাকবে কিনা, সেটা আরও বড় চ্যালেঞ্জ। প্রথম চ্যালেঞ্জে হয়তো উতরে যাবেন (যদিও রেজিনগর নিয়ে সংশয় আছেই)। কিন্তু দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জে এর মধ্যেই হেরে বসে আছেন। ভয়মুক্ত ভোটের পরিবেশ তৈরি করতে পারেননি। ভোটের দিন সেই সন্ত্রাস আরও বাড়বে, এখনই হলফ করে বলা যায়। বিজেপি হয়তো জিতবে, কিন্তু প্রশাসক শুভেন্দুর বড় পরাজয় অনিবার্য। এই দেওয়াল লিখনটা এখনই পড়ে ফেলা যায়।

মমতার চেয়েও বেশি অসহায় যেন শুভেন্দু

রক্তিম মিত্র

যখনই কারও হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেওয়া হত, তখন মুকুল রায়ের কণ্ঠে সেই চেনা সংলাপ শোনা যেত— ‘মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে রাজ্যে যে বিশাল উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, তাতে সামিল হতেই সবাই তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন।’

কয়েক বছর পর কথাটা আর মুকুল রায়কে বলতে হত না। ততদিনে সংলাপটা সবার মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা যোগ দিতে আসতেন, তাঁরা জানতেন, কী বলতে হবে। তাঁরা সেই বুলিই আওড়াতেন। ‘বিরোধী দলে থেকে কাজ করতে পারছি না। তাই উন্নয়নে সামিল হতে চাই।’

সেই মুকুল রায় নেই, কিন্তু প্রবাদটা থেকে গেছে। মমতা ব্যানার্জি আছেন ঠিকই, কিন্তু ক্ষমতার বৃত্ত থেকে অনেক দূরে। হরিশ চ্যাটার্জি



স্ট্রিটের বাড়িতে বসে নিশ্চয় মাঝে মাঝে টিভি চালান। হাতে থাকা ফোনেও অনেক ভিডিও চলে আসে। তিনি নিশ্চয় দেখছেন, তিনি যা যা করতেন, নতুন মুখ্যমন্ত্রীও কী সুন্দর তাঁকেই অনুসরণ করছেন। এমন ছাত্র তৈরি করেছেন, গর্ব করতেই পারেন।

নন্দীগ্রামে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন সঞ্চিতা প্রধান দে। তিনি মনোনয়ন জমা করলেন। প্রচারও শুরু করে দিলেন। এই পরিস্থিতিতে নন্দীগ্রামে তৃণমূল যে জেতার মতো জায়গায় নেই, বিজেপি বিরাট ব্যবধানে জিতবে, এটা সবাই জানে। এটা বোঝার জন্য কোনও রাজনৈতিক বোদ্ধা হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু অবাক করল একটি ছবি। মুখ্যমন্ত্রীর উল্টোদিকে বসে আছেন সেই তৃণমূলের প্রার্থী ও তাঁর স্বামী। এবং জানা গেল, তাঁরা মনোনয়ন তুলে নিচ্ছেন। এবং যথারীতি, লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন সিদ্ধান্ত তাঁকে কেন নিতে হল? ভোটে দাঁড়ানোর পর হঠাৎ করে কি তাঁর মনে হল, শুভেন্দু অধিকারী খুব ভাল লোক, আর মমতা ব্যানার্জি খুব খারাপ? আগের সরকারও পুলিশকে খুব নগ্নভাবে দলীয় কাজে

লাগাত। এই সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। এই আমলেও পুলিশ শাসকের হুকুম তামিল করা পেয়াদা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সহজ কথাটা সহজে বলাই ভাল। সঞ্চিতা নিজের ইচ্ছেয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। তাঁকে আনা হয়েছে। লোভ দেখিয়েও হতে পারে। ভয় দেখিয়েও হতে পারে। আগামীদিনে তাঁর কী পুনর্বাসন হচ্ছে, সেটা দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কেউ কেউ এটাকে কৌশল হিসেবে দেখতে চাইছেন। কেউ কেউ শুভেন্দুর বাজিমাৎ হিসেবেও দেখতে চাইছেন। কেউ কেউ বোঝাতে চাইছেন, মমতা কতটা অসহায়। নিজের প্রার্থীও তাঁর কথা শুনছেন না।

মমতা কী করলেন? তাঁর প্রার্থী লড়াই থেকে সরে গেছেন। এই অবস্থায় কিছুটা বাধ্য হয়েই কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থন করলেন। এবার কী দেখা গেল? সেই কংগ্রেস প্রার্থীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। তাঁর নামে নাকি প্রায় ১৮ বছর আগে একটি মামলা রয়েছে। এমন মামলা তো অনেকের নামেই রয়েছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর নামেও অন্তত পঁচিশখানা মামলা রয়েছে। হঠাৎ, কংগ্রেস প্রার্থীর নামে পুরনো মামলার কথা মনে পড়ল? তিনি তো ফেরার ছিলেন না। গত চার মাসে পুলিশ ধরেনি কেন? সেই পুরনো প্রবাদটা মনে পড়ছে, দুরাশ্বার ছলের অভাব হয় না।

যেভাবেই হোক, শাসকের জয়গান করতে হবে। তার হাজারটা খারাপ কাজকেও তারিফ করতে হবে। আগের সরকারের মতো এই সরকারের আমলেও এটাই ধ্রুব সত্য। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিপক্ষ দলের প্রার্থীকে প্রার্থীপদ

থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। তারপর হুঙ্কার দিচ্ছেন, ‘কী করে ভোট করাতে হয়, আমি জানি।’

মমতা সত্যিই হয়তো অসহায়। কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশি অসহায় মনে হল বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে। পরিষ্কার করে বলা দরকার, তিনি ক্ষমতার অপব্যবহারই করলেন। কোনও কৌশল নয়। নিজের চেয়ারকে কলঙ্কিতই করলেন। বিপক্ষ প্রার্থীকে লোভই দেখান, আর ভয়ই দেখান, দুটোই সমান নিন্দনীয়। এর বাইরে তৃতীয় কিছু ঘটেনি। একজন মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা এতে একফোঁটাও বাড়ল না। বরং অনেকটাই নেমে গেল।

গত পাঁচ বছরে যেভাবে লড়াই করেছেন, সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। বেশ কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বেশ কিছু ঘটনায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন, দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে তিনি উঠতে পারছেন না। ইতিহাস বারবার পরীক্ষা নিয়ে যায়। সেই পরীক্ষায় মাঝে মাঝেই তিনি ডাঁহা ফেল করে যাচ্ছেন। নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন ছিল তেমনই এক পরীক্ষা। হয়তো বিরাট ব্যবধানে বিজেপি জিতবে। কিন্তু সেটা মোটেই সাফল্য নয়। ক্ষমতার অবপ্যবহার করে একজন বিপক্ষ প্রার্থীকে লড়াই থেকে সরিয়ে দিলেন। অন্য এক বিরোধী প্রার্থীকে আঠারো বছরের পুরনো মামলায় গ্রেপ্তার করালেন। ভোট এবার কেমন হবে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

বিরাট ব্যবধানে বিজেপি জিতবে। মুখ্যমন্ত্রী আবার হুঙ্কার ছাড়বেন। সেদিন তাঁকে আরও বেশি করে অসহায় মনে হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের এলাকায় তিনি একটা ভয়মুক্ত ভোট করাতে পারলেন না। এটা কতবড় কলঙ্ক, এটা বোঝার ক্ষমতাও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

মায়েদের ‘ললিপপ’ দেওয়ার সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে

সৃজন শীল

সেই বাম জমানার কথা। পাতাপুকুর রেল লাইনের ধারে পাওয়া গেল রিজওয়ানুর রহমানের দেহ। আত্মহত্যা নাকি খুন, তা নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠল বঙ্গ রাজনীতি। যদি আত্মহত্যা হয়, তবে প্ররোচনা কার? পদত্যাগ করতে হল পুলিশ কমিশনারকে। সরকারের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দেওয়া হল তীর ঘৃণা। ভাবখানা এমন যেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই খুন করিয়েছেন। তৃণমূলের বিভিন্ন সভায় নিয়ম করা বজ্জতা করানো হল রিজওয়ানুরের মাকে। দাদা রুকবানুরকে দেওয়া হল বিধানসভার টিকিট। পরপর তিনবার তিনি নদিয়ার চাপড়া থেকে বিধায়কও হলেন।

পনের বছর পেরিয়ে গেল। খুন না আত্মহত্যা, আজও জানা গেল না। কিন্তু যাঁদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ! অভিযুক্ত পুলিশরা পেলেন প্রোমোশন। অভিযুক্ত নেতা হয়ে গেলেন ক্যাবিনেট মন্ত্রী। মেয়ের বাবা হয়ে গেলেন তৃণমূলের মারওয়াড়ি সেলের সভাপতি।

রিজওয়ানের মায়ের খবর অনেকদিন পাই না।



নন্দীগ্রামেও পাওয়া গিয়েছিল আরও এক মা-কে। পুলিশের গুলিতে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের একজনের মা ফিরোজা বিবি। ‘শহিদের মা’ এই তকমা দিয়ে তাঁকে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রার্থী করলেন মমতা। জিতেও গেলেন। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেল, সেই ফিরোজা বিবির চালচলন আমূল বদলে গেছে। এক বছরের মধ্যেই বোলেরো গাড়ি নিয়ে কলকাতায় আসা-যাওয়া শুরু করলেন। এলাকায় নানা অভিযোগ ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর নামে। কিন্তু সহজে বাদ দেওয়াও যাবে না। তাঁকে বাদ দিতে গেলে ভারী কোনও নাম আনতে হত। ২০১৬ তে শুভেন্দুকে প্রার্থী করলেন নন্দীগ্রাম থেকে। তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল পাঁশকুড়া



পশ্চিমে। পরে তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল, দল আর খোঁজটুকুও নেয় না। সেই ভিডিও এখনও চাইলেই দেখা যায়।

বছর দুই আগের কথা। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে প্রাণ হারালেন এক চিকিৎসক। সেই অভয়ার ন্যয়বিচারের দাবিতে কত সভা, কত মিছিল। তদন্ত গেল সিবিআই-এর হাতে। দু'বছর পর নিট ফল কার্যত শূন্য। রাজ্য সরকার ধামাচাপা দিয়ে যে তত্ত্ব হাজির করেছিল, সিবিআই-ও যেন তারই জেরক্স কপি জমা দিল। কারা আসল মাথা, সেদিকে হাত বাড়ানো তো দূরে থাক, তদন্তকে যতটা বিপথে চালানো যায়, সিবিআই ঠিক সেটাই করল। আদালত বারবার ভ্রুসনা করেছে। টনক নড়েনি। আর দশটা দুর্নীতির মামলায় সিবিআই যেমন অস্থিম্ভ্র প্রসব করেছিল, এক্ষেত্রেও তাই। তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে তারা কতটা ব্যর্থ ও অপদার্থ, সেই ধারাবাহিকতা যথারীতি বজায় রেখেছে সিবিআই।

কিন্তু আবার আসরে এক 'মা'। অভয়ার মা দাঁড়িয়ে পড়লেন নির্বাচনে। যে সিবিআই তাঁর মেয়ের হত্যা রহস্যকে প্রহসনে পরিণত করেছে, সেই সিবিআই-কে যারা চালায়, সেই শাসক দলের হয়েই। সহানুভূতির হাওয়ায় জিতেও গেলেন। রাজ্য সরকারও শুরুতে দেখাল, তারা বিরাট তৎপর। কিন্তু প্রায় পাঁচ মাস হতে চলল। ন্যয়বিচার তো দূরের কথা, তার ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারেনি সিবিআই। আসলে, অভয়ার মায়ের হাতে বিধায়ক নামক ললিপপ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিবিআই যাই করুক, তাঁর মুখে কুলুপ পড়েই গেছে।

এবার আরও এক 'মা'। শুভেন্দু অধিকারীর আগু সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা। ভোটের ফল বেরোনোর দুদিনের মাথায় খুন হলেন চন্দ্রনাথ। চার মাস পেরিয়ে গেল। এবারও তদন্তে সিবিআই। কয়কেটা সুপারি কিলার, ভিন রাজ্য থেকে কয়েকজন ভাড়াটে খুনি ধরপাকড় হল। কিন্তু আসল মাথা কে, তা এখনও বেশ ধোঁয়াটে। কেনই বা খুন, তাও পরিষ্কার নয়।

এক্ষেত্রে অবশ্য সিবিআই আদালতে একটা চার্জশিট জমা দিয়েছে। কোন পথ দিয়ে আততায়ীরা এসেছিল। কোন বন্দুকে খুন করা হয়েছিল। সেই বন্দুক কোথায় কেনা হয়েছিল। গাড়ির নম্বর প্লেট কোথায় বদল করা হয়েছিল। এমন নানা রোমহর্ষক বর্ণনা আছে। কিন্তু এবারও আসল জায়গায় অষ্টরম্ভ। আসল খুনি কে, কী তার উদ্দেশ্য, এটা নিয়ে যা দাবি করা

হয়েছে, তাকে আঘাতে গল্প বলেই মনে হচ্ছে।
বাস্তবের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক আছে বলে মনে
হয় না।

কিন্তু সহানুভূতি দরকার। তার থেকেও বড়
কথা, মায়ের মুখ বন্ধ করা দরকার। অতএব,
তাকেও টিকিট দিয়ে দাও। নন্দীগ্রামে তিনিই
বিজেপির প্রার্থী। অভয়ার মায়ের মতো তিনিও
নিশ্চিতভাবেই জিতে যাবেন। কিন্তু যথাযথ
তদন্ত বা বিচার হবে কি? সম্ভাবনা নেই
বলেই চলে।

একদিকে, সিবিআই চার্জশিটে ভিনরাজ্যের
একজনকে মূল অভিযুক্ত বলে দাবি করল।
অন্যদিকে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী
ময়দানে হাওয়া গরম করতে নেমে পড়লেন।
তিনি বলে বসলেন, এটা ভাইপো গ্যাংয়ের
কাজ। একজন মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে কোন
বালখিল্যতার স্তরে নামাতে পারেন, আরও
একবার দেখা গেল। প্রশাসনের প্রধান হয়ে
তদন্তের আগেই দুম করে এভাবে বলে দেওয়া
যায়? দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় মমতার সঙ্গে তাঁর
কোনও তফাতই থাকছে না। যদি সত্যিই
ভাইপো জড়িয়ে থাকেন, তাহলে সিবিআই
চার্জশিটে তো তাঁর নামটুকুও উল্লেখ নেই।
তাহলে হিম্মৎ বলুন, সিবিআই গাঁজা খেয়ে
ভুল চার্জশিট দিয়েছে।

ভাইপোর নানা অপকীর্তি আছে। কারণ,
ভাইপো জানেন, দিল্লিতে তাঁর প্রভাবশালী
মামারা আছেন। তাঁকে কেউ ছুঁতে পারবে



না। কিন্তু এই খুনের সঙ্গে ভাইপোর যোগসূত্র
থাকার সম্ভাবনা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য
নয়। চন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কীসের শত্রুতা?
বরং, চন্দ্রনাথের মৃত্যুর আসল কারণ সামনে
এলে তা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খুব একটা
স্বস্তিদায়ক হবে না।

এক্ষেত্রেও ন্যায়বিচারের সম্ভাবনা কম।
ললিপপ হিসেবে আরও একজন মা বড়জোর
বিধায়ক হবেন। তাঁর মুখ চিরচরে বন্ধ হয়ে
যাবে।

অনেক হল। এবার এই ভণ্ডামি বন্ধ হোক।
শাসকের কাজ ন্যায়বিচার দেওয়া। সেটা যদি
দিতে না পারেন, ললিপপ হিসেবে বিধায়ক
পদের টোপ দেবেন না। মায়েদেরও অনুরোধ,
অতীত থেকে শিক্ষা নিন। কী আগের সরকার,
কী এই সরকার, এঁরা সঠিক তদন্ত করবে না।
মুখ বন্ধ রাখার জন্য একটা গাজর ঝুলিয়ে
দেবে। ছেলে বা মেয়ের মৃত্যু নিয়ে এমন সওদা
নাইবা করলেন!



হুমায়ূনের
কাছে
সব ‘মাস
লিডার’কেই
ম্লান মনে হয়

অজয় কুমার

যে যাই বলুন, হুমায়ুন কবীরকে আমার কিন্তু বেশ লাগে। না, আইপিএস হুমায়ুন নন, ইনি মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন। বাংলার রাজনীতিতে যদি হাতে গোনা পাঁচজন মাস লিডার থেকে থাকেন, তাঁদের একজন অবশ্যই এই হুমায়ুন।

কে কত জনপ্রিয়, ভোট এলে বোঝা যায়। দলের টিকিট পেয়ে যিনি এক লাখ ভোটে জিতছেন, তিনি একবার নির্দল হয়ে দাঁড়ান। পাঁচ হাজার ভোটও পাবেন কিনা সন্দেহ। সেখানে হুমায়ুন দলের পরোয়া করেন না। প্রতীকের পরোয়া করেন না। তিনি একাই রাজা।

এবারের নির্বাচনের কথাই ধরুন। একসঙ্গে দুটি কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নওদা আর



শুধু বামে। কিন্তু মহম্মদ সেলিমকেও তাঁর ‘মন বুঝতে’ যেতে হয়েছিল।

হুমায়ূনের ক্যারিশ্মা বুঝতে গেলে ফিরে যেতে হবে দশ বছর আগে। ২০১৬-র নির্বাচনে তিনি সবার কাছেই ব্রাত্য। তৃণমূল টিকিট দিল না। কংগ্রেসও ফিরিয়ে নিল না। কী করবেন? একাই দাঁড়িয়ে পড়লেন নির্দল হয়ে। হেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সবার বিপক্ষে লড়ে প্রায় ৭৫ হাজার ভোট পেয়েছিলেন। বাংলায় আর কোন নির্দল প্রার্থী ৭৫ হাজার ভোট পেতে পারেন? দূরবিন

রেজিনগর। দুটিতেই বিরাট ব্যবধানে জয়ী। কারও সঙ্গে জোট করার দরকার পড়েনি। বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস, বাম— সবাইকেই অনেক পিছনে ফেলে তিনি জয়ী। পুলিশের আনুকূল্য পেয়েছেন, এমনটাও বলা যাবে না। বরং, পুলিশের কাছ থেকে বারবার হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে।

রাজনীতির আঙিনায় এই হুমায়ুন প্রায় সব ঘাটেই জল খেয়েছেন। কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক হয়েছেন, তৃণমূলের টিকিটেও বিধায়ক হয়েছেন, নির্দল হয়ে দুটি কেন্দ্রে জয়ী, বিজেপির হয়ে লোকসভাতেও লড়েছেন। যাননি

লাগিয়েও এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে?

বাংলায় নির্দল হয়ে জেতার নজির কম নেই। তাঁর জেলা মুর্শিদাবাদেই অধীর চৌধুরি মাঝে মাঝেই নির্দল দাঁড় করাতেন। কখনও নিয়ামত শেখ, কখনও মনোজ চক্রবর্তী, কখনও অপূর্ব সরকারকে জিতিয়ে এনেছে। কিন্তু তাঁদের পিছনে অধীর ছিলেন। কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি ছিল। কিন্তু হুমায়ূনের পিছনে কেউ ছিল না।

এবার শুভেন্দু অধিকারী দুটি জায়গায় জিতেছেন। ভবানীপুরে হারিয়েছেন



মমতা ব্যানার্জির মতো হেভিওয়েট প্রার্থীকে। কিন্তু বিজেপির দলীয় প্রতীক আর কেন্দ্রের আনুকূল্য না থাকলে? জেতা তো দূরের কথা, তিরিশ হাজার ভোট পেতেন কিনা সন্দেহ। সেখানে হুমায়ুন একাই দেখিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর কলজের জোর কতটা।

হয়তো বলতে পারেন, মুসলিম ভোট। হয়তো বলতে পারেন, সাম্প্রদায়িক প্রচারের ফল। কিন্তু ওই দুই কেন্দ্রের অধিকাংশ প্রার্থীই তো মুসলিম। কই, তাঁরা তো মুসলিম সমাজের আস্থা অর্জন করতে পারলেন না! তাঁরাও তো সাম্প্রদায়িক তাস কম খেলেনি। আসলে, হুমায়ুনের মধ্যে কিছু একটা

আছে, যা বাকিদের মধ্যে নেই।

এবার নির্বাচনের আগে তিনি বলে বসলেন, ‘মমতা ব্যানার্জি যদি বিধানসভায় যেতে চান, তিনি যদি রেজিনগর থেকে লড়তে চান, আমি সিট ছেড়ে দিতে পারি। তাঁকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠানোর দায়িত্ব আমার।’ কজনের এই বুকের পাটা আছে? সত্যিই, মমতার কী দুর্দিন। হুমায়ুন কবীর কিনা বলছেন, তাঁকে জেতানোর দায়িত্ব আমার! হাতি কাদায় পড়লে এমন কতকিছুই না হজম করতে হয়!

নন্দীগ্রামে বিজেপি একতরফা জিতবে। কিন্তু রেজিনগর! লড়াইটা খুব সহজ হবে না। পুলিশকে শাসকদল যেভাবে ব্যবহার করছে, তা মোটেই সুস্থ প্রশাসনের লক্ষণ নয়। একের পর এক পুরনো মামলায় যেভাবে হুমায়ুনের সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে, অন্তত নৈতিকভাবে বিজেপি হেরে বসে আছে। রাজ্যে দুশোর বেশি আসন। বিরোধী বলে কার্যত কিছু নেই। তারপরও শাসক দল হুমায়ুনকে যেভাবে ভয় পাচ্ছে, তা শাসকদলের দৈনতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। যদি হুমায়ুন পুত্র নাও জেতেন, নিশ্চিতভাবেই দ্বিতীয় স্থানে থাকবেন। বাকি সব দল অনেক পিছিয়ে থাকবে।



পঞ্চায়েতের মতোই, গ্রাম চেনার সহজ পাঠ

বিপ্লব মিশ্র

গ্রামের হাসপাতাল। নামেই হাসপাতাল। দরজা আছে, জানলা আছে, ডাক্তার আছেন। হয়তো একটা স্টেথোস্কোপও আছে। নেই শুধু রোগী। হাসপাতালের উঠোনে রোগীর ভিড়ের বদলে আগাছা মাথা তোলে। ওষুধ আছে কি না জানা নেই, কিন্তু মানুষের বিশ্বাস নেই। শহর থেকে আসা ডাক্তারটি প্রথম দিনেই বুঝে যান—এখানে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ প্রেসক্রিপশন লেখা নয়। মানুষকে

হাসপাতালে ফিরিয়ে আনা।

এই জায়গা থেকেই শুরু ‘গ্রাম চিকিৎসালয়’। TVF-এর তৈরি এই হিন্দি ওয়েব সিরিজের গল্প ভাটকাভি গ্রামের প্রায় এক পরিত্যক্ত এক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ঘিরে। শহুরে মেডিক্যাল শিক্ষায় তৈরি তরুণ ডাক্তার প্রভাত সিংহ এখানে এসে যেন অন্য এক ভারতের মুখোমুখি হন। এখানে রোগী চিকিৎসকের কাছে আসে না। চিকিৎসককেই পৌঁছতে হয় রোগীর কাছে। আর সেই পথ শুধু মাটির রাস্তা দিয়ে তৈরি নয়—তার



মধ্যে মিশে থাকে কুসংস্কার, অভ্যাস, দারিদ্র্য, অবিশ্বাস, স্থানীয় রাজনীতি এবং বহু বছরের জমে থাকা ক্ষত।

ডাঃ প্রভাতের ভূমিকায় আমোল পরাশর। চরিত্রটির মধ্যে কোনও নায়কোচিত আড়ম্বর নেই। বরং আছে বিরক্তি, অসহায়তা, ভুল করা, আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা। প্রথম দিকে তাঁর মনে হয়, তিনি যেন ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ভটিকাভির মানুষ তাঁর কাছে ‘কেস’ নয়, মানুষ হয়ে উঠতে শুরু করে। আর সেখানেই বদলে যায় প্রভাতও। এই বদলে যাওয়াটাই সিরিজটির প্রাণ।

অন্যান্য চরিত্রগুলিকেও ভাল আর মন্দার মোড়কে না ফেলাই ভাল। নানা রঙের মিশেল। ভালর মধ্যে মন্দ যেমন আছে, আবার মন্দের মধ্যে ভালর সম্ভানও আছে। হাতুড়ে চিকিৎসকের মধ্যেও যেমন মানুষের অসহায়তার সুযোগ নেওয়ার প্রবণতা আছে,

তেমনই আছে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা। সরকারি ব্যবস্থার মানুষটির মধ্যেও যেমন দায়িত্বহীনতা আছে, তেমনই আছে নিজের মতো করে কিছু করার চেষ্টা। এই ধূসর জায়গাটাই ‘গ্রাম চিকিৎসালয়’-কে আলাদা করে।

কারণ সিরিজটি গ্রামকে সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা করেনি। এখানে সর্ষে-ফুলের ক্ষেত আছে, কিন্তু তার পাশেই আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবস্থা। এখানে মানুষ অতিথিপরায়ণ, আবার কুসংস্কারেও বিশ্বাসী। এখানে সম্পর্কের উষ্ণতা আছে, আবার জাতপাত, অর্থাভাব, শিক্ষার অভাবও আছে। অর্থাৎ গ্রাম কোনও ছবির পোস্টকার্ড নয়। গ্রামও একটি জীবন্ত সমাজ।

একজন মানুষ কেন সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে যায়? কেন হাসপাতালের বিছানা খালি পড়ে থাকে? কেন একজন ডাক্তারকে গ্রামের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়? কেন স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা তৈরি করাও চিকিৎসারই অংশ? প্রশ্ন উঠবে। উত্তর কোথাও স্পষ্ট, আবার কোথাও আবছা।

এই কারণেই ‘গ্রাম চিকিৎসালয়’



বিনোদন থাকে না। শহরের মানুষ হিসেবে আমরা গ্রামের কথা বলি। গ্রামকে ভালোবাসার কথাও বলি। কিন্তু কতটা চিনি?

‘গ্রাম চিকিৎসালয়’ সেই চেনার সুযোগ দেয়। শেখায়, গ্রাম মানে শুধু সবুজ মাঠ নয়। গ্রাম মানে অসংখ্য মানুষের জীবন, হাসি-কান্না, ভয়, ভুল, অভিমান, বেঁচে থাকার লড়াই। সেই মানুষদের কাছে পৌঁছতে গেলে শুধু হাসপাতাল বানাতেই হয় না, দরকার আস্তা।

দেখতে দেখতে কখনও হাসি পায়, কখনও মন খারাপ হয়। কখনও মনে হয়, আমরা শহরে বসে গ্রামের মানুষকে কত সহজে বিচার করি। অথচ তাদের জীবন, ভয়, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস—এসবের ভিতরে না ঢুকে তাদের সিদ্ধান্তের বিচার করা কত সহজ!

‘পঞ্চায়েত’-এর মতোই এখানে গ্রাম আছে, কিন্তু এই গ্রামের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তে হয় আরও গভীরে। প্রশাসন নয়, এখানে আলোচনার কেন্দ্রে স্বাস্থ্য। হাসপাতাল নয়, আসলে আলোচনার কেন্দ্রে মানুষ। আর সেই মানুষগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়েই সিরিজটি একসময় নিছক

সিরিজটি শেষ হয়ে গেলে তাই ভাটকাডিকে একটু মনে পড়ে। মনে হয়, কোথাও একটা ছোট্ট হাসপাতালের উঠোনে এখনও হয়তো আগাছা গজিয়ে আছে। হয়তো কোনও ডাক্তার বসে আছেন রোগীর অপেক্ষায়। আর দূরের কোনও গ্রাম থেকে একজন মানুষ ধীরে ধীরে সেই হাসপাতালের দিকে হাঁটছেন। সেই হাঁটটুকুই হয়তো বদলের শুরু।

‘গ্রাম চিকিৎসালয়’ তাই শুধু একটি ওয়েব সিরিজ নয়। এটি শহর থেকে গ্রামের দিকে তাকানোর একটি জানলা। আর সেই জানলা দিয়ে একবার তাকালে—গ্রামকে হয়তো আর আগের মতো দেখা যায় না।



সেই তো থিলার আর ভূত

মলয় সেন

গত কয়েকবছরে একটা অদ্ভুত ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। শহরের নানা প্রান্তে বিশাল হোর্ডিং। সিনেমার নয়, সিরিয়ালেরও নয়। আসলে, ওয়েব সিরিজ। সিনেমা হল, টিভির বাইরেও খুলে গেছে অন্য একটা দিগন্ত। অর্থাৎ, হলে যাওয়ার দরকার নেই। টিভির সামনে বসারও দরকার নেই। মোবাইলেই মগ্ন থাকুন। সেখানেই যা দেখার, দেখে নিন।

একের পর এক ওটিটি চ্যানেল হাজির হয়ে গেছে। নিত্যনতুন কনটেন্ট নিয়ে তারা হাজির। বিনোদন জগতের নতুন দরজা যেন খুলে গেছে। কত নতুন নতুন কনটেন্ট নিয়ে ছবি হচ্ছে। প্রথমত, এখানে বাজেট অনেকটাই কম। ফলে, এমন অনেক কনটেন্ট শুনে থোড়িউসার পালিয়ে যান। কিন্তু এখানে অল্প বাজেট। ফলে সেইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা

অন্যাসে করা যায়। বড়সড় তারকা নিতে পারলে ভাল। না নিলেও ক্ষতি নেই। একটা পরিচিত মুখ থাকলেই হল। তিনি টেনে নিয়ে যাবেন। বাকি দু'একজন অল্প পরিচিত। বাকিরা আনকোরা হলেও চলে যায়।

কিন্তু অল্প টাকায় ছবি হলে তার কিছু ভাল দিক যেমন থাকে, তেমনই কিছু বেনোজলও ঢুকে পড়ে। যে পারছেন, পরিচালক হয়ে যাচ্ছেন। রিসার্চের নামে যা খুশি গেলানো হচ্ছে। শহরজুড়ে হোর্ডিং, তার ওপর সোশ্যাল মিডিয়ায় লাগাতার ক্যাম্পেইনিং তো আছেই। লোকে ভাবছেন, দারুণ কিছু কনটেন্ট। কিন্তু একটা বা দুটো পর্ব দেখার পরই মোহভঙ্গ হতে সময় লাগছে না।

আবার কোনও কোনও ওয়েব সিরিজ যেন সিরিয়ালেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। মেগা সিরিয়াল যেমন বছরের পর বছর চলে, এটাও তেমন দশ এপিসোড, বারো এপিসোডে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সিরিয়াল যদি নেশা ধরতে পারে, তাহলে ওয়েব সিরিজই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এখানেও ঢুকে পড়ছে পরকীয়া। ঢুকে পড়ছে মেলোড্রামা। ঢুকে পড়ছে পারিবারিক কূটকচালি। সাসপেন্সের নামে অকাতরে ঢুকে পড়ছে ভায়োলেন্স। আর যৌনতার সুড়সুড়ি তো আছেই।

সবকিছুরই নিজস্ব খন্দের আছে। কেউ খুনখারাপি দেখতেই ভালবাসেন। কেউ ভালবাসেন সারাক্ষণ ঝগড়া দেখতে।

কূটকচালি তো দারুণ উপাদেয়। সিরিয়ালে দেখে নিজের সংসারে সেগুলো প্রয়োগ করা। মফস্বলের কত পরিবারে নিত্য অশান্তি সেইসব কূটকচালির প্রয়োগকে ঘিরে। এসব নিয়ে আর্থসামাজিক সমীক্ষা হওয়াটা খুব জরুরি। শুধু কিছু সিরিয়াল জনজীবনকে কতখানি বিষিয়ে দিয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। সেই প্রবণতা এবার কি ওয়েব সিরিজের হাত ধরেও চলে আসছে!

ইদানীং নতুন একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে, সেশন ওয়ান, সেশন টু। মানে, সেশন ওয়ানে আট-দশ পর্ব। এমন জায়গায় শেষ করা হচ্ছে, যা 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। 'অন্তরে অতৃপ্তি' থেকেই যাচ্ছে। সেই অতৃপ্তি থেকেই হাজির হয়ে যাচ্ছে সেশন টু। অর্থাৎ, আরও আট-দশ পর্ব। আসলে, যেন মেগা সিরিয়ালেরই কন্টিনিউয়েশন।

ভাল কনটেন্ট অবশ্যই স্বাগত। নতুন প্রযুক্তি থেকেও মুখ ফিরিয়ে থাকার উপায় নেই। কিন্তু সেই প্রযুক্তির হাত ধরে, নতুন ধারার হাত ধরে আবার যদি সেই বিষবাস্প ঢুকে পড়ে, তা বেশ উদ্বেগের। ওয়েব সিরিজের শুরুর দিনগুলোয় কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গিয়েছিল, যাক, সিরিয়ালের কূটকচালি থেকে কিছুটা অন্তত মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু গত কয়েক বছরে আস্তে আস্তে ওয়েব সিরিজেরও সিরিয়ালীকরণ হয়ে গেল। ভাল ছবিকে যেমন আট ফিল্ম বলে দাগিয়ে দেওয়া হত, এখানেও ভাল কনটেন্ট আবার সেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে না তো!



রক্তিম মিত্র

একটা চালু কথা আছে, সিপিএম-কে রাস্তায় পাওয়া যায় না, ফেসবুকে পাওয়া যায়। কথাটা মূলত বিরোধীরাই বলে থাকেন। আসলে, রাস্তার আন্দোলন গণমাধ্যমে সেভাবে উঠে আসে না। আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এলেও যাঁরা বাম অনুরাগী, মূলত তাঁরাই দেখতে পান।

কিন্তু এই ফেসবুকে থাকাটা দলকে কতটা এগিয়ে দিচ্ছে, আর কতটা পিছিয়ে দিচ্ছে? কোনও সন্দেহ নেই, অনেক যথার্থ বাম মনস্ক, চিন্তাশীল মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়। তাঁদের একেকটি পোস্ট সত্যিই বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত রুচির পরিচয় বহন করে। মনে হয়, সত্যিই চিন্তা চেতনায় এঁরা অনেক অগ্রণী। এঁরা সমাজকে নতুন দিশা দেখাতে পারেন।

এটা মুদ্রার একটা পিঠ। কিন্তু অন্য পিঠটা বেশ ভয়ঙ্কর। এবং বলাই বাহুল্য, তাঁরাই সংখ্যায় ভারী। তাঁদের পোস্ট বা কমেন্ট পড়লে সত্যিই করুণা হয়, কখনও কখনও আবার রাগও হয়। মনে হয়, এমন সমর্থক থাকলে সেই দলের শূন্যই হওয়া উচিত। এমন সমর্থক দলের সম্পদ নন, বিরাট এক বোঝা। এই মন্ত ‘বোঝা’কেও বয়ে চলতে হয়।

শরিক দল সম্পর্কে এঁদের এতটাই বিদ্বেষ,

শরিকের
চেয়ে বড়
শত্রু নেই

তৃণমূল বা বিজেপি সম্পর্কেও এতটা নেই।
এঁরা বিশ্বাস করেন, শরিকরা আছে বলেই
সিপিএম ক্ষমতায় আসছে না। শরিকরা
না থাকলেই খেই খেই করে সিপিএম
একাই ক্ষমতায় চলে আসত। এঁরা বিশ্বাস
করেন, কোনও শরিকের পায়ে তলায়
মাটি নেই। সংগঠন বলে কিছু নেই। সব
শরিকরা তৃণমূলকে ভোট দেয়।

মাঝে মাঝে ভাবি, এঁদের এই চিন্তার
উৎসটা কী? যখন ফেসবুক ছিল না,
তখনও এমন কথা বলা লোকের অভাব
ছিল না। এখন ফেসবুকে জ্ঞান দেওয়ার
সুযোগ বেড়েছে, যা খুশি লিখে দেওয়া
যাচ্ছে। কোনও সন্দেহ নেই, সিপিএম
নেতৃত্ব অনেক সংযত। অন্তত প্রকাশ্যে
বেফাঁস কথা তেমন বলেন না। প্রকাশ্যে
বাম ঐক্যের কথাই বলেন। কিন্তু যেটা
টিভির ব্যূমের সামনে বলছেন, দলের
অভ্যন্তরেও তেমনটাই বলেন তো! মনে
হয় না। নইলে, এই ফেবু পত্নীরা এমন
বেলাগাম হওয়ার ‘কুশিক্ষা’ পেতেন না।
এইসব কথা তাঁরা তৃণমূল বা বিজেপির
কাছ থেকে শেখেননি। টিভি থেকেও
শেখেননি। তাঁরা দলীয় স্তরে কোথাও
একটা এইসব কথা অনর্গল শুনেছেন।
সেভাবেই নিজেদের মস্তিষ্কে নির্মাণ
করেছেন। নেতাদের মতো সংযম হয়তো
নেই। তাই ফেবুকে লিখে বসছেন। খুব
সহজ কথা, এঁদের অধিকাংশের মধ্যে
বামপন্থী চেতনাই নেই। আদৌ এঁরা

শরিকদের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন কিনা
সংশয় থেকেই যায়।

সম্প্রতি রেজিনগর উপনির্বাচনকে ঘিরে
সেটা আবার প্রকাশ্যে এল। এই আসনটি
আগে নওদা বিধানসভার মধ্যে ছিল।
সেখান থেকে দীর্ঘদিন আরএসপি লড়াই
করে এসেছে। দীর্ঘদিন বিধায়ক ছিলেন
প্রবাদপ্রতিম জয়ন্ত বিশ্বাস। ২০১১
থেকে রেজিনগর আলাদা কেন্দ্র। পরের
তিনবারও আরএসপি-ই লড়েছে। এবার
সিপিএম দাবি করে বসল, এই আসনে
তারা লড়বে। আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত
হতেই পারত। কিন্তু বোঝাপড়ায় কোথাও
একটা ঘাটতি থেকে গেল। দুপক্ষই প্রার্থী
দিল। পরে প্রতীক নিয়ে সমস্যা হওয়ায়
আরএসপি সরে দাঁড়াল।

কিন্তু তারপরেও নানা আক্রমণ ধেয়ে
আসছে। আরএসপি-র হয়ে যিনি
মনোনয়ন জমা করেছিলেন, সেই
প্রার্থীর একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম।
বেশ দায়িত্বশীল নেতার মতোই কথা
বলছিলেন। বাম ঐক্যের পক্ষেই
বলছিলেন। অধিকাংশ কথাই বেশ
ইতিবাচক। সিপিএম মনস্ক লোকেদেরও
খারাপ লাগার কথা নয়। কিন্তু ইন্টারভিউ
দেখার বা শোনার সময় কোথায়? একের
পর এক গালাগাল কमेंট বক্সে ভেসে
এল। গোটা ইন্টারভিউ শোনার পর বুঝতে
পারলাম না, গালাগাল খাওয়ার মতো



তিনি কী এমন কথা বলেছেন। এক-দুটো বাক্যে হয়তো একমত না হতে পারেন, তাই বলে এমন নিম্নস্তরের আক্রমণ?

কমেন্টগুলো পড়লে মনে হবে, আরএসপি-কে ছাড়া হত হলেই এই সিট নাকি জিতত না। এবার সিপিএমের প্রতীকে লড়াই। জয় অনিবার্য। এঁরা কোন জগতে বাস করেন? রাজ্যে কটা কেন্দ্রে আরএসপি বা ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল? অধিকাংশ আসনেই তো সিপিএম লড়াই করেছে। সেই তো একটি আসন এসেছে। অধিকাংশ জায়গায় গড় ভোট সেই দশ হাজারের আশেপাশে। পাঁচ থেকে ছয় পারসেন্ট। লোকসভাতেও সিপিএম অর্ধেকের বেশি আসনে লড়েছে। জেতা তো দূরের কথা। কটা আসনে দশ পারসেন্টের বেশি ভোট এসেছে?

এই সহজ সত্যিটা এই ফেবু পন্থী বাম কর্মীরা

বুঝতেই চান না। শরিকদের গালমন্দ করেই যত আনন্দ। সেটাও যদি তথ্যের ভিত্তিতে হত, তাহলেও বুঝাতাম, কিছুটা পড়াশোনা আছে। এঁরা অশোক ঘোষ বা ত্রিদিব চৌধুরির নামটুকুও শোনেননি। এমনকী বিনয় চৌধুরির নামটুকুও শুনেছেন বলে মনে হয় না। এঁদের কাছে কলকাতাও যা, কোচবিহারও তাই। এঁদের কাছে বর্ধমানও যা, বালুরঘাটও তাই। এই কুপমণ্ডুকদের জগৎ ফেসবুকেই শুরু, ফেসবুকেই শেষ।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। কোচবিহার জেলা বরাবরই ফরওয়ার্ড ব্লকের দুর্গ। এমনকী, ২০১১ তেও এই জেলায় চারটি আসনে ফব প্রার্থীরা জিতেছিলেন (কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ)। অনেকে বলতেই পারেন, সিপিএমের জন্যই জিতেছিলেন। অবশ্যই সিপিএমের অবদান ছিল। কিন্তু

যে চারটি আসনে সিপিএম নিজে লড়াই করেছে, সেই মাথাভাঙা, শীতলকুচি, নটাবাড়ি, তুফানগঞ্জে কিন্তু সিপিএমকে বড় ব্যবধানেই হারতে হয়েছিল। সিপিএম অন্যদের জেতাতে পারে, নিজেরা জিততে পারে না কেন? কারণ, ওই চার জায়গায় ফব ভোট আর সিপিএম ভোট যোগ হয়েছিল। ওই চার জায়গায় ফব-র একটা নিজস্ব ভোট ব্যান্ড ছিল। ২০১৬তে জেলায় একটি আসনেই বামেরা জয়ী হয়েছিল, কোচবিহার উত্তর। ২০১৮-র পঞ্চায়েতে এই বিধানসভার দুটি অঞ্চলে ফব সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। জেলায় আর কোথাও বামেরা পঞ্চায়েত দখল করতে পারেনি। সিপিএম অন্য চারটি আসনের মধ্যে যে কোনও একটি নিতেই পারত। কিন্তু জেলা নেতৃত্বের জেদ, তাঁরা কোচবিহার উত্তরই নেবেন। কিছুটা জেদ করে এবার কোচবিহার উত্তরে নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাল সিপিএম। ফল কী হল? সেই পাঁচ হাজার ভোট। আসনটা ফবকে ছাড়লে অন্তত দশ হাজার ভোট আসতে পারত। এমনকী ফব যদি নিজেদের সম্মুখে এককভাবে লড়ত, তাহলেও অন্তত পাঁচ হাজারের বেশি ভোট পেত।

কোনও সন্দেহ নেই, শরিকদের সেই আগের শক্তি নেই। সংগঠন অনেকটাই দুর্বল। কর্মীরা আগের মতো সক্রিয়

নন। সেটা তো সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সিপিএমের প্রভাব ও সংগঠন যে জায়গায় ছিল, এখন কি তার দশ শতাংশ আছে? জেলায় জেলায় যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন, শরিক দলের কর্মীরা হয়তো কিছুটা নিষ্ক্রিয়, হয়তো মিটিং মিছিল আগের মতো হয় না। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই কিন্তু ঝান্ডা বদল করেননি। দলের নীরব সমর্থক হয়ে আছেন। অন্তত বাম প্রার্থীকে ভোটটুকু দেন। কিন্তু বিভিন্ন ব্লকে খোঁজ নিন। সিপিএমের যাঁরা একসময়ের দোদুল্লপ্রতাপ জোনাল কমিটি, লোকাল কমিটি আলো করে থাকতেন, তাঁদের অনেকেই অন্য শিবিরে ভিড়ে গিয়েছেন। এক সময় মার্কস কপচানো সেই নেতা হাতে চারটি, পাঁচটি আঙুটি পরে দিব্যি জয় শ্রীরাম বলছেন। কুড়ি বছর আগে যাঁরা জোনাল স্তরে ছিলেন, এখন তাঁরা কোথায় আছেন, একটা সমীক্ষা হোক, তাহলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। শরিক দলের শক্তিস্রাস হয়েছে, কিন্তু এতটা অধঃপতনও হয়নি।

প্রশ্নটা খুব সহজ, রেজিনগরে যদি আরএসপি দাঁড়াত, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? ফেসবুক দেখে মনে হচ্ছে, এতদিনে নিজেদের প্রতীক পেয়ে সিপিএম দারুণ উজ্জীবিত। জয় যেন সময়ের অপেক্ষা। দশ হাজার পেরোয় কিনা, দেখার অপেক্ষা রইল।



অন্তত একটিপুজো সংখ্যা কিনে দেখুন

অরিন্দ্র দাস

পুজোয় যেমন ছিল নতুন জামাকাপড়, তেমনি পুজো মানে ছিল পুজো সংখ্যাও। অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির ঘরেই কোনও না কোনও পুজো সংখ্যা নেওয়া হত। কোনও কোনও বাড়িতে একাধিক পুজো সংখ্যাও দেখা যেত।

কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই চেনা ছবিটা যেন বদলে গেছে। এখন পুজো সংখ্যা যেন লুপ্তপ্রায় এক প্রজাতি। অধিকাংশ ঘরেই এখন আর পুজো সংখ্যা দেখা যায় না। কারণ হিসেবে বলা হয়, এখন নাকি আর পড়ার সময় নেই। সত্যিই কি এখন আমরা সবাই বিরাট ব্যস্ত হয়ে পড়েছি?

চারপাশে তাকিয়ে দেখলে এমনটা তো মনে হয় না। দিব্যি সারা দিন লোকে



ফোনে মুখ গুঁজে আছে। তরুণ প্রজন্মকে একা দায়ী করে লাভ নেই। মাঝবয়সী, এমনকী বয়স্করাও ফোনেই মগ্ন। গৃহবধূরাও কিন্তু ফাঁক পেলেই বিরাট একটা সময় কাটান ফোনের সঙ্গেই। এতই যদি ব্যস্ততা, তাহলে ফোন হাতে দিনে সাত-আট ঘণ্টা কাটানোর সময় পাওয়া যায় কীভাবে?

আসলে, আমরা পড়তে ভুলে গেছি। আসলে, আমাদের ধৈর্য তলানিতে এসে ঠেকেছে। এক পাতা পড়ার জন্য যে মনোযোগ দরকার, সেটুকুও আমাদের নেই। অথচ, এই সহজ সত্যিটা স্বীকার করার মতো সংসাহস টুকুও নেই। শুধু তাই নয়, অন্য কেউ কথা বললে,

দু মিনিট সেই কথা শোনার শিষ্টাচার টুকুও নেই। তার মাঝেই পাঁচ বার ফোন ঘাটতে হবে।

কিন্তু শুধু নিরাশা দিয়ে তো জীবন চলে না। যে সু অভ্যেস আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আমাদেরই তা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই পুজো থেকেই না হয় সেই অভিযান শুরু হোক। এবার পুজোর আগে অন্তত একটা করে পুজো সংখ্যা কিনুন। যেটা খুশি। পুরোটা পড়তে হবে না। আপনার যেসব লেখা পছন্দ, সেগুলোই পড়ুন। যদি দশটা লেখাও পড়তে পারেন, সেটাও জানবেন বিরাট প্রাপ্তি। জানবেন, আপনার ভেতর থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষটাকে কিছুটা হলেও খুঁজে পেলেন।

ঘৃণা নিয়ে নিজেরা থাকুন, ওঁদের খেলতে দিন

ধীমান সাহা

ছোট থেকেই একটা কথা শুনে আসছি, দেশপ্রেম। শব্দটা শুনলেই মনের মধ্যে কেমন একটা সন্মম তৈরি হত। এই শব্দটা শুনলেই দেশ নায়কদের মুখ মনে পড়ে যেত। নিজেদের গর্বিত ভারতীয় বলে মনে হত।

কিন্তু গত কয়েক বছরে এই শব্দটা যেভাবে ব্যবহার হচ্ছে, তাতে সন্মম বা সমীহ নয়, কিছুটা যেন অরুচি ধরে গেছে। একের পর এক অসভ্যতাকে দেশপ্রেমের মোড়ক দিয়ে চালানো হচ্ছে। যে যখন পারছেন, নিজেদের মূর্খতাকে ও ব্যর্থতাকে আড়াল করতে এই দেশপ্রেম শব্দটাকে ঢাল করছেন। এই পবিত্র শব্দটাকে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছেন, দেশপ্রেম শুনলেই কেন জানিনা মনে হচ্ছে এর পেছনে নিশ্চিতভাবেই কোনও ঘৃণার চাষবাস চলছে।



এই মূর্খতা নিজেরা দেখিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তাদের সুরে সুর না মেলালেই অন্যদের গায়ে দেশদ্রোহী তকমাও এঁটে দিচ্ছেন। নিজেদের মূর্খামি এবং অসভ্যতাকে খেলার মাঠেও জোর করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এশিয়া কাপ জয়ের পর ভারতের মহিলা ক্রিকেটাররা ট্রফি নিতে গেলেন না। তাঁরা ট্রফি বয়কট করলেন। কারণটা কী?



যিনি এশিয়া কাপ তুলে দেবেন, তিনি পাকিস্তানের লোক। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতির নাম মহসিন নাকভি। মাস দুই আগে স্পেন যখন ফুটবল বিশ্বকাপ জিতল, তাদের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন ফিফার প্রেসিডেন্ট। ভারত যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতল, তখন ট্রফি তুলে দিলেন আইসিসির প্রেসিডেন্ট। এশিয়া কাপ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল আয়োজিত টুর্নামেন্ট। স্বাভাবিক যুক্তিতেই পুরস্কার তুলে দেওয়ার কথা এসিসি প্রেসিডেন্টের।

কিন্তু ভারতীয় বোর্ডের গোঁ, মহসিন নাকভি ট্রফি দিলে তারা ট্রফি নেবেন না। বোর্ডের নির্দেশ বলে কথা। হরমণপ্রীত কাউর, স্মৃতি মন্সানাদের সেই নির্দেশ মেনে চলতেই হবে। এক বছর আগেও ঠিক এমনই ঘটনা ঘটেছিল। এবার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতের পুরুষ দল। কোচ গৌতম গম্ভীর, অধিনায়ক সূর্য

কুমার যাদব। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও তাঁরাও ট্রফি নেননি। সেবারও সেই একই যুক্তি, পাকিস্তানের লোকের হাত থেকে ট্রফি নেব না।

পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাওয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম এজেন্ডা। নিজেদের যাবতীয় ব্যর্থতা ও অক্ষমতাকে আড়াল করতে তাদের ভরসা সেই পাকিস্তান। অতয়েব, সারাক্ষণ ঘৃণা ছড়িয়ে যাও। আর এই ঘৃণা ছড়ানোর কাজে পেটোয়া চ্যানেলগুলি তো আছেই। লাগাতার এই ঘৃণা বর্ষণকেই দেশপ্রেমের মডেল বলে চালানো হচ্ছে। ঘৃণা করার এই ফতোয়া চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্রিকেটারদের ওপরেও। তাদেরও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলানো চলবে না। পাকিস্তানের লোক ট্রফি দিলে সেই ট্রফি নেওয়া চলবে না।

নিজেদের পলিটিক্যাল এজেন্ডা নিয়ে নিজেরা থাকুন। দোহাই, ক্রিকেটারদের উপর এই ফতোয়া চাপিয়ে দেবেন না। ঘৃণা ছড়ানোর কাজটা শাসক দলকেই ভাল মানায়। যাঁরা সত্যিকারের দেশের হয়ে লড়াই করছেন, দোয়া করে তাঁদেরকে দেশপ্রেম শেখাতে যাবেন না। আপনাদের ঘৃণা নিয়ে আপনারা থাকুন। ওদের মন দিয়ে ক্রিকেটটা খেলতে দিন।



ব্রাজিল ম্যাচেও মুখ পোড়া সময়ের অপেক্ষা

বিপ্লব মিশ্র

সেই সাতাশত্রে এসেছিলেন পেলে। পঞ্চাশ বছর পার হতে চলল। এখনও সেই স্মৃতির ঢেঁকুর তোলে কলকাতা। যাঁরা সেই ম্যাচে খেলেছিলেন, তাঁরা যে অনুষ্ঠানেই যান, ঘুরেফিরে সেই পেলে ম্যাচের প্রসঙ্গ এসেই যায়। প্রায় সবার বাড়ির ড্রয়িংরুমেই বেশ বড় করে বাঁধানো সেই ম্যাচের ছবি। যাঁরা খেলেছিলেন, তাঁদের সুখস্মৃতিতে থাকবে, সেটা স্বাভাবিক। যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরাও এখনও সুযোগ পেলেই সেই ম্যাচের গল্প শোনান।

আর যাঁদের তখনও জন্মই হয়নি, যাঁরা এখনও পঞ্চাশের নীচে, তাঁরাও এতবার শুনেছেন, সব ঘটনাই বলে দিতে পারবেন। ফুটবল সম্রাট পরেও এই শহরে এসেছেন। কিন্তু তাঁকে ঘিরে সেই উন্মাদনা আর তৈরি হয়নি।

এবার আসছে আস্ত ব্রাজিল দল। সেবার কসমস ক্লাবকে নিয়েই যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, এবার খোদ ব্রাজিলকে ঘিরে তো উন্মাদনা আরও ছাপিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কেন জানি না, মনে হচ্ছে, এই ম্যাচ সুপার ফ্লপ হতে চলেছে। এমন একটা ম্যাচে যদি গ্যালারি ফাঁকা থেকে যায়, সেটা শহরের পক্ষে কম

লজ্জার হবে না। কিন্তু আয়োজকদের অদূরদর্শিতায় হয়তো সেটাই হতে চলেছে।

প্রথমত, কলকাতার মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে যে আবেগ, জাতীয় দলকে ঘিরে কখনই সেই পর্যায়ে আবেগ নেই। তাই কলকাতায় যখন জাতীয় দলের ম্যাচ হয়, অধিকাংশ সময়ে গ্যালারি ফাঁকাই থাকে। একমাত্র দুই দশক আগে ভারত-জাপান ম্যাচকে ঘিরে একটা উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এবার সেটাও চোখে পড়ছে না। কিন্তু এই সহজ সত্যটা উদ্যোক্তারা বুঝতেই পারছেন না। তাঁরা এমন লাগামছাড়া টিকিটের মূল্য রেখেছেন, যা মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের আয়ত্বের বাইরে। গত বছর যখন মেসি এসেছিলেন, তখন দর্শকরা অনেক চড়া দামের টিকিট কেটেছিলেন। কী নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল, তা আর কারও অজানা নয়। মেসিকে ঘিরে যে উন্মাদনা, ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের ঘিরে সেই উন্মাদনা কখনই সেই পর্যায়ে পৌঁছোবে না। নেইমার এলে তবু কথা ছিল। কিন্তু এই ব্রাজিলের ম্যাচ দেখতে ছয় হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে বাঙালি যাবে, এটা একটু বেশিই আশা করা হয়ে যাচ্ছে।

সরকার খেলার উন্নয়নে যতটা তৎপর, গিমিকের আগ্রহ তার থেকে ঢের বেশি। এসেই যুবভারতীর মুখ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল সেই ফুটবলারের মূর্তি। এবার মনে হল, গোটা স্টেডিয়ামকে গেরুয়া করে দিলে কেমন হয়! তাই হল।

যুবভারতীর টানেলে ঢোকার মুখে পেলের একটা মস্তবড় ছবি ছিল। কিন্তু সেই ছবি ঢেকে দেওয়া হল। কারণ, পেলের পাশে মমতা ব্যানার্জি ছিলেন। সেই ছবি সরিয়ে কোন ছবি আনা হল? নরেন্দ্র মোদি আর শুভেন্দু অধিকারীর ছবি। খুব ঘট করে বলা হয়েছিল, মেসি ম্যাচের যে কেলেক্সারি, তার তদন্ত হবে। কিন্তু খোদ অরুণ বিশ্বাস শিবির বদলে ঢুকে পড়েছেন অন্য শিবিরে। ছবি তোলার ব্যাপারে নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী আগ্রহ কম নয়। তিনি যেভাবে ভিডিও আর রিলস করায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, নিশ্চিতভাবেই আগের ক্রীড়ানীকে ছাপিয়ে গেছেন।

মোদা কথা, একটা ম্যাচ সফলভাবে আয়োজন করতে গেলে যে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, তা এই সরকারের নেই। যে সদিচ্ছা দরকার, সেটাও নেই। কিছু পেটোয়া লোকের ভুলভাল পরামর্শই চলছেন। ভাবছেন, ব্রাজিলের নামেই হুহু করে টিকিট বিক্রি হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা খবর, তিরিশ হাজার টিকিটও বিক্রি হয়নি। বলা হল, এই ম্যাচের টিকিট কিনলে উরুগুয়ে ম্যাচ ফ্রি। বোঝাই যাচ্ছে, উরুগুয়ে ম্যাচের অবস্থা আরও খারাপ। ক্লাবগুলিকেও টিকিট দেওয়া হয়নি। প্রাক্তন ফুটবলাররাও ব্রাত্য। শেষদিন হয়তো ঢালাও টিকিট বিলি হবে। কিন্তু তাতেও মুখরক্ষা হবে না।

মেসি কাণ্ডে এই শহরের মুখ পুড়েছিল। ব্রাজিল ম্যাচেও মুখ পোড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।



মধ্যবিত্তের মানচিত্রে আসুক সুন্দরবন

স্নেহা সেন

এই রাজ্যের পর্যটনে একটি উজ্জ্বল মুকুট হল সুন্দরবন। দুপাশে বিশাল জঙ্গল। তার মাঝে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। জঙ্গলের বুক চিরে নদীর বুক জলযান নিয়ে এগিয়ে চলা। ভাবতেই অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ কাজ করে।

এই সুন্দরবনকে আকর্ষণীয় করার জন্য রাজ্য সরকার নাকি নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। বিদেশি পর্যটকেরা যেন আরও নিশ্চিত্তে সুন্দরবন ভ্রমণ করতে পারেন, সেই ব্যাপারে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু এসব করতে গিয়ে সুন্দরবন ভ্রমণ যেন আরও ব্যয়বহুল না হয়ে যায়, সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার।



বেসরকারি অপারেটররা যা নিচ্ছেন, তার চার গুন খরচ নেওয়া হচ্ছে! সরকারি লঞ্চ পরিমাণেও অত্যন্ত কম। যে সময়ে মানুষ বেশি করে ঘুরতে যান, সেই সময়ে খুব একটা পাওয়াই যায় না। ডিসেম্বর পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে সর্বসাকুল্যে তিনবার ছাড়বে। অর্থাৎ, মাসে একবার। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারিতেও হয়তো মাসে একবার বা দুবার। বরং, যখন গরম পড়ে যায়, সেই মার্চ-এপ্রিলে তিন-চার বার করে লঞ্চ ছাড়ছে।

সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের দুটি লঞ্চ চলছে। দু'বছর আগেও মাথাপিছু খরচ ছিল ছয় থেকে সাত হাজার টাকা। গত বছর হঠাৎ করে রেট বাড়িয়ে দেওয়া হল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খরচ বাড়বে, সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু একলাফে যদি দ্বিগুন বেড়ে যায়, সেটা বেশ দুশ্চিন্তার। ছিল ছয় হাজার। এক লাফে সেটা হয়ে গেল বারো হাজার। দুই রাত্রি, তিনদিনের ট্যুর। মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাথাপিছু বারো হাজার সত্যিই ব্যয়বহুল।

যেখানে বেসরকারি ট্যুর অপারেটররা এই দুই রাত্রি, তিনদিনের ট্যুর করাচ্ছেন তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকায়। মানছি, সরকারি লঞ্চ ও অন্যান্য পরিষেবা তুলনায় অনেকটাই উন্নত। তার জন্য খরচ কিছুটা বেশি হতেই পারে। বড়জোর দ্বিগুন হোক। তাই বলে

কারা এই সূচি নির্ধারণ করেন, তাঁদের পর্যটন সম্পর্কে আদৌ কোনও ধারণা আছে কিনা, সত্যিই সংশয় জাগে।

সরকার বদল হয়েছে। উদ্যমী পর্যটনমন্ত্রী কাছে আবেদন, সুন্দরবনের বিষয়টি নতুন করে চিন্তাভাবনা করুন। বেসরকারি ট্যুর অপারেটররা যদি তিন থেকে সাড়ে তিন হাজারে ভ্রমণ করাতে পারেন, তাহলে সরকার কেন পাঁচ-ছয় হাজারে পারবে না? অন্তত নভেম্বর, ডিসেম্বরে সপ্তাহে একবার করে কেন লঞ্চ ছাড়া যাবে না? বিদেশি পর্যটকদের জন্য অত্যাধুনিক ব্রিজ থাকুক। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি যেন আরও কম খরচে, নিরাপদে সুন্দরবন ভ্রমণ করতে পারেন, তার উদ্যোগ নেওয়া হোক। এরপরেও যদি আগের সূচিই বজায় থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, পর্যটন সম্পর্কে নতুন সরকারও একইরকম উদাসীন।



নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা কাফের গাঁও

উত্তম জানা

ছোট্ট এক গ্রাম। কাফের গাঁও।

কালিম্পং শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয় কাফের গাঁও। অথচ সেখানে পৌঁছানোর পর মনে হয়, শহরটা যেন বহু দূরে কোথাও পড়ে আছে। মোবাইলের ব্যস্ততা, গাড়ির হর্ন, মানুষের তাড়া—সবকিছু একে একে পিছনে ফেলে পাহাড়ের কোলে এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে সবুজের ঢেউ, চারদিকে পাহাড়, আর তার মাঝখানে

মাঝবয়সে এসে বুঝেছি, বেড়ানোরও বয়স হয়। একসময় ভ্রমণ মানেই ছিল যত বেশি জায়গা দেখা যায়। সকালে বেরিয়ে সারাদিন ছুটে বেড়ানো, একের পর এক দর্শনীয় স্থান, ছবি তোলা, ফিরে এসে আবার পরের দিনের পরিকল্পনা। এখন আর সেসব ভালো লাগে না। এখন বরং এমন একটা জায়গা চাই, যেখানে কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। যেখানে অলস



হয়ে বসে থাকা যায়। কিংবা কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই হাঁটা যায়। কাফের গাঁও ঠিক তেমনই।

জায়গাটার কথা কয়েক বছর আগেও শুনিনি। লাভার কথা জানতাম, লোলেগাঁওয়ের কথাও জানতাম। বেশ কয়েক বছর আগে লোলেগাঁও গিয়েওছি। কিন্তু তার কাছেই যে এমন একটা নির্জন গ্রাম রয়েছে, তা তখন শুনিনি। কিন্তু ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে পাহাড় আর অচেনা পাহাড় নেই। ফেসবুকে বেড়ানোর বিভিন্ন গ্রুপ যেমন আছে, তেমনই ইউটিউবেও নানা ভিডিও আপনার

হাতের নাগালে। আপনি একটু ভ্রমণপিপাসু হলে, ভ্রমণের কয়েকটা ভিডিও দেখলে, এমন কত অজানা ঠিকানার হৃদিশ আপনার মোবাইল বেয়ে এসে যাবে!

কয়েক মাস আগে থেকেই একটা প্রাথমিক পরিকল্পনা। সঙ্গে নিলাম অফিসেরই এক সহকর্মীকে। পাহাড়ি গ্রামে ঘোরার ব্যাপারে তারও আগ্রহ বেশ ভালই। ট্রেনে এনজেপি। সেখান থেকে শিলিগুড়ি জংশন হয়ে শেয়ারে লোলেগাঁও। বাকি পথটুকু নিয়ে গেল হোম স্টে থেকে পাঠানো গাড়ি। হোম স্টেও ছিল যথার্থ হোম স্টের মতোই। অর্থাৎ, বাঁ চকচকে বিলাশ বহুল ব্যাপার নয়। বরং, পাহাড়ি আন্তরিকতায় মোড়া। তাঁদের বাড়িতে, তাঁদেরই একজন হয়ে তিনটে দিন কাটিয়ে দেওয়া।

সকালে ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। শহরের অ্যালার্মের সঙ্গে এই ডাকের কোনও তুলনাই হয় না। জানলা খুলতেই ঠান্ডা বাতাস এসে মুখে লাগল। দূরের পাহাড় তখনও মেঘের পাতলা চাদরে ঢাকা। কোথাও কোনও ব্যস্ততা নেই। চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় বসে মনে হল, এতদিন ধরে আমরা আসলে কীসের জন্য এত ছুটেছি? সেদিন কোনও পরিকল্পনা

করিনি। শুধু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।

লেগে যাওয়ার মধ্যে।

পাহাড়ি গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটার মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ আছে। রাস্তা কখনও উঠছে, কখনও নেমে যাচ্ছে। দু'পাশে ঘাস, গাছপালা, ছোট ছোট বাড়ি। কোথাও পাহাড়ের ঢালে চাষের জমি, কোথাও বাঁশঝাড়। মাঝেমাঝে দু-একজন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা। তাদের মুখে তাড়াহুড়োর চিহ্ন নেই। মনে হয়, সময় এখানে অন্যভাবে চলে।

বিকেলের দিকে পাহাড়ের আলো বদলে গেল। দূরের আকাশে কমলা রং ছড়িয়ে পড়ছে। আমি তখন গ্রামের এক নির্জন পথের ধারে দাঁড়িয়ে। আশপাশে কেউ নেই। শুধু বাতাসে পাতার শব্দ। সেই মুহূর্তে মনে হল, জীবনে আসলে খুব বেশি কিছু লাগে না। একটু সময়, একটু নির্জনতা আর সামনে ছড়িয়ে থাকা প্রকৃতি—এই তো!

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখি, নীচে গভীর খাদ। তার ওপারে আরও পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে রোদ আর ছায়ার খেলা। একটু পরেই মেঘ এসে ঢেকে দিল সব। আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে মেঘ সরে গিয়ে খুলে গেল সবুজের বিশাল ক্যানভাস। প্রকৃতি যেন নিজের মতো করে ছবি আঁকছে, আবার মুছেও দিচ্ছে।

কাফের গাঁও থেকে ফিরে আসার সময় তাই মনটা অদ্ভুত ভারী হয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, জায়গাটা শুধু দেখে এলাম না; কিছু একটা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। হয়তো নিজের জন্য একটু সময়। হয়তো ভুলে যাওয়া কিছু প্রশ্নের উত্তর।

হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম, এই পথের আসল সৌন্দর্য কোনও নির্দিষ্ট দৃশ্য নয়। সৌন্দর্যটা লুকিয়ে আছে হাঁটার মধ্যেই। একা হাঁটতে হাঁটতে নিজের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে। পাখির ডাক শুনতে শুনতে হঠাৎ কোনও পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ার মধ্যে। কিংবা কোনও কারণ ছাড়াই ভালো

শহরে ফিরে আবার ব্যস্ততা শুরু হবে। ফোন বাজবে, কাজ জমবে, মানুষ তাড়া দেবে। তবু জানব, পাহাড়ের কোলে এমন একটি গ্রাম আছে, যেখানে একদিন আমি কোনও গন্তব্য ছাড়াই হেঁটেছিলাম।

আর সেই হাঁটায়, অনেকদিন পর, নিজেকেই যেন নতুন করে খুঁজে পেয়েছিলাম।



রিনচেনপং

রবি ঠাকুর

কিন্তু

এখানে

এসেছিলেন

উত্তম জানা

কবীর সুমনের সেই চেনা গানের লাইন, ‘আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিছু করার নেই।’

বিশ্বাস করুন, পাহাড়ি গ্রাম রিনচেনপংয়ে গিয়ে ঠিক এই কথাগুলোই মনে পড়ছিল। গানটা পুরোটাই জানা। ফলে, তিনদিনের সফরে বেশ কয়েকবার গেয়েওছিলাম। সফরসঙ্গী বন্ধু একটুও বিরক্ত হয়নি। বরং বারবার শুনতে চাইছিল। গলার গুণে নয়, গানটার গুণে। আরও বেশি করে প্রকৃতির গুণে। আসলে, পাহাড় মনের মধ্যে অদ্ভুত এক উদারতা এনে দেয়। তখন বেসুরো গানকেও দিব্যি হজম করা যায়।

সত্যিই কোথাও যাওয়ার তাড়া ছিল না। কিছুই করার ছিল না। সব ব্যস্ততাকে পিছনে ফেলেই

আশ্রয় নিয়েছিলাম পাহাড়ের কোলে।
পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে কখনও কখনও
মনে হয়, কোথাও না গেলেই বোধহয়
সবচেয়ে ভাল হয়।

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং—দর্শনীয়
জায়গার তালিকা হাতে নিয়ে পাহাড়ে
পৌঁছে আমরা ছুটতে থাকি। এই
ভিউপয়েন্ট, ওই মঠ, আর একটু দূরে
জলপ্রপাত—একটার পর একটা জায়গা
টিক দিতে টিক দিতে কখন যে পাহাড়ের
আসল সৌন্দর্যটাই হারিয়ে ফেলি, টেরও
পাই না। রিনচেনপং সেই তাড়া থেকে মুক্তি
দেয়। রিনচেনপং গ্রামটার কথা দু-একটা
পত্রিকায় ইতি উতি পড়েছিলাম। তখনও
ইউটিউবের এমন রমরমা হয়নি। তাই
পড়েই মনে মনে একটা দৃশ্যকল্প সাজিয়ে
ছিলাম। গিয়ে দেখলাম, যা ভেবেছিলাম,
তার চেয়ে ঢের সুন্দর।

পশ্চিম সিকিমের এই ছোট পাহাড়ি
জনপদে পৌঁছে মনে হয়, এখানে কিছুই
করার নেই। আর সেই ‘কিছুই না করা’-
টাই যেন সবচেয়ে বড় কাজ। আমরা দুই
বন্ধু গিয়েছিলাম বর্ষার সময়ে। এই বৃষ্টির
সময়ে অনেকেই পাহাড়কে এড়িয়ে চলেন।
টানা বৃষ্টি হলে ঘরবন্দি হয়েই কেটে যায়।
কিন্তু ওই যে, আমাদের কোথাও যাওয়ার
ছিল না। তাই, ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা ছিল
না। বর্ষায় রিনচেনপংয়ের রূপ আরও
অন্যরকম। মেঘ এসে পাহাড়ের গায়ে

বসে থাকে। কখনও চারপাশ একেবারে
সাদা, কিছুই দেখা যায় না। আবার হঠাৎ
মেঘ সরে গেলে দূরে পাহাড়ের শরীর দেখা
যায়। বৃষ্টির ফোঁটা টিনের ছাদে টুপটাপ
শব্দ করে। আর আপনি বসে আছেন
ডাকবাংলোর বারান্দায়।

রিনচেনপংয়ের সেই পুরনো ফরেস্ট
ডাকবাংলো যেন এই অলস সৌন্দর্যেরই
অংশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই অঞ্চলে
এসেছিলেন—তাঁর পদচিহ্নের স্মৃতি
রিনচেনপংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।
পাহাড়ে যত যাই, এই মানুষটার ওপর যেন
শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। এত বছর আগে,
এই দুর্গম পাহাড়েও তিনি এসেছিলেন!
আম বাঙালি এত বছর পরেও যার হৃদিশ
জানে না, সেখানে এত বছর আগে তিনি
এই জায়গার সন্ধান পেলেন কীভাবে?
নিশ্চয় এখানে কোনও কবিতা বা গানও
লিখেছেন। রবীন্দ্র জীবনীকাররা জানলেও
জানতে পারেন।

তবে, ডাকবাংলোটি সত্যিই চমৎকার।
অনেকটা খোলা জায়গা। আর সামনে লম্বা
বারান্দা। এখানে হেলানো চেয়ারে বসে
থাকার রোমাঞ্চই আলাদা। বারান্দায় বসে
ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃষ্টি দেখা যায়। কোনও
বই পড়তে পারেন, চা খেতে পারেন,
কিংবা কিছুই না করে শুধু মেঘের ওঠানামা
দেখতে পারেন।

তবে ডাকবাংলোটি এখন পর্যটকদের জন্য নিয়মিত খোলা থাকে কি না, যাওয়ার আগে অবশ্যই স্থানীয় বন দফতরের সঙ্গে খোঁজ নিয়ে নেওয়া ভাল। আর যদি ডাকবাংলোয় থাকা না-ও হয়, মন খারাপ করার কিছু নেই। রিনচেনপংয়ে এখন বেশ কিছু সুন্দর হোমস্টে তৈরি হয়েছে। কাঠের ঘর, জানলার বাইরে পাহাড়, ঘরোয়া রান্না— আর সবচেয়ে বড় কথা, আতিথেয়তায় সেই পুরনো পাহাড়ি আন্তরিকতা। শহরে হোটেলের ‘সার্ভিস’-এর সঙ্গে যার কোনও তুলনাই হয় না। সন্ধ্যায় হয়তো বাড়ির লোকের সঙ্গে গল্প জমবে। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসবে গরম ভাত, ডাল, পাহাড়ি সবজি কিংবা স্থানীয় কোনও রান্নার গন্ধ।

রিনচেনপং যেতে হলে কলকাতা থেকে প্রথমে নিউ জলপাইগুড়ি। সেখান থেকে গাড়িতে সিকিমের দিকে। জোরথাং হয়ে রিনচেনপংয়ের রাস্তা ধরা যায়। দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু পাহাড়ি রাস্তার সৌন্দর্যের জন্য সময় হাতে রাখা ভাল। শিলিগুড়ি থেকে গাড়িতে মোটামুটি চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ।

ভোরে ঘুম ভাঙুক পাখির ডাকে। জানলা খুলে দেখুন, পাহাড়ের গায়ে আলো কীভাবে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সকালের চা শেষ করে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়ুন। কোনও গন্তব্যের প্রয়োজন নেই। সরু রাস্তা ধরে হাটুন। দু’পাশের বাড়ি

দেখুন। পাহাড়ি মানুষের দৈনন্দিন জীবন দেখুন। কোনও অচেনা পাখির ডাক শুনে থমকে দাঁড়ান। ইচ্ছে হলে কোনও বাড়িতে ঢুকেও পড়তে পারেন। এটুকু বলতে পারি, গৃহকর্তা বিরক্ত হবেন না। চা খেতে খেতে গল্প জুড়ে দিতেই পারেন। অনেকটা সেই তু মান ইয়া না মান, ম্যায় তেরা ম্যাহেমান— এর মতো।

বিকেলে আকাশ বদলাতে দেখুন। সন্ধ্যে নামুক খুব ধীরে। পাহাড়ে সন্ধ্যে আসলে যেন কেউ আলোটা একবারে নিভিয়ে দেয় না—আস্তে আস্তে রং বদলায়। তারপর অন্ধকার। রিনচেনপংয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়তো কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যও নয়। সুমন দিয়ে শুরু করলাম। এবার নচিকেতায় আসাই যায়। মনে হবে, ‘যখন সময় থমকে দাঁড়ায়।’ এখানে কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। কোনও দর্শনীয় স্থান দেখতেই হবে না। কোনও ছবি তুলতেই হবে না। শুধু বসে থাকুন।

বৃষ্টি দেখুন। মেঘ দেখুন। পাখির ডাক শুনুন। নিজের সঙ্গে একটু কথা বলুন। সফরসঙ্গীর জীবনের কত অজানা কথা আপনি জানেন না। এই সুযোগে জেনে নিলে মন্দ কী! সবার বুকেই অনেক কথা জমে থাকে। পাহাড়ই পারে অনেক না বলা কথার স্রোতকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে। সেই বহুতী নদী আপন বেগে পাগলপারা হয়ে বয়ে যাক।

বঙ্গ টাইমস

১ অক্টোবর, ২০২৬



bengaltimes.in

**ISSN
2445-5657**